International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 36-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.36-41

বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিফলন

অভিজিৎ সাহা
গবেষক (পি.এইচ. ডি.), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract

Literature is the mirror of society. Whatever happents in the world is reflected in literature. Since, the society and literature are complement of each other; if the men of letters speaks out whatever he wants, the rights would be violated. One has to take his writing as worthy and responsible to the society. The responsibility of a writer is to be the path maker of development but the creation should not imply his personal interest. Actually literary works should not be used only to express an author's view but also as a tool of the society. However, finding out remedies for society's reformation is not his soul duty, that belongs to the social reformer. Whereas the writer should reflect himself and his works as the mirror to the society. They are the holders who try to keep up with the problematic, intolerable, unwanted aspect of the society. And his efforts are well scripted in his practice of literature. Ultimately Literature is the reflection of the society.

The real life experience experienced by author is reflected in his literary work with his excellent imagination and suitable representation. The social discriminations like upper class-lower class, rich-poor, Caste system always influence the authors. The pain and sufferings of this discrimination can pave way into a writer's work. Sometimes the texts are silent to every social reality and sometime they are alive and revolting to everyone's suffering. In the full-fledged discussion paper an attempt has been made to highlight the story of "lower caste society in literature" with the help of four stories 'Bhoter Sabitribala' 'Chhotolok' 'Durba' 'Budhni' written by the author Banaphul (Balai Chand Mukhapadhyay).

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। কাজেই সাহিত্যিক যদি যথেচ্ছাচার করেন, তবে অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাঁকে ভাবতে হয় তাঁর লেখার মূল্য আছে এবং তাঁর দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে। সাহিত্যিকের কাজ উত্তরণের পথ দেখানো, শুধু বানিয়ে লেখাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আসলে সাহিত্যকের কাজ পাঠকমহলে নিজেকে প্রকাশ করা। প্রতিকারের চিন্তা করা কিন্তু সাহিত্যিকের কাজ নয়। সে কাজ সমাজ সংস্কারকের। নিজেকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে সন্তোষ, আর না পারলেই যন্ত্রণা। পরে তাঁকে নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সাহিত্যে তা প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজ আর সাহিত্য এ দুটো তো পাশাপাশি চলে। সাহিত্য যেমন সমাজের দর্পণ, আবার সমাজও সাহিত্যের আরশি। আবার এও বলতে পারি সমাজ

ও সাহিত্য দুটো সমান্তরাল লাইনের মাধ্যমে- একে অন্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এ জিনিসটি তো চিরকালই আছে, তবে আগের দিনে সমাজ ও সাহিত্য এ দুটোর মধ্যে রক্ষণশীল প্রভাব একটু থাকতোই। একালে রক্ষণশীল মনোভাবটি ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার 'বেপরোয়া' ভঙ্গিটাকেই 'আধুনিকতা' বলে গণ্য করা হচ্ছে। কাজেই এর গতি দূরন্ত হয়ে চলেছে। একথা সত্য যে, লেখকের জীবনে বা জীবনপথে যা কিছু ঘটে, যা কিছু তিনি নিজে উপলব্ধি করেন সেসব অভিজ্ঞতার কথাই তাঁর জীবনধর্মী সাহিত্যে স্থান পায়। আসলে সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। আমাদের সাহিত্যে যেমন বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি বর্তমান সমাজেও পাশ্চাত্য জীবনের প্রবল প্রভাব ভারতীয় জীবনধারায় দ্রুত বদল ঘটিয়ে চলেছে। যেটা আদৌ স্বাস্থ্যকর কিনা তা ভাববার বিষয়।

এই পরিবর্তিত সমাজে চাপা পড়ে থাকে এমন কিছু মানুষ যারা নিত্য-নৈমিত্তিক কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলতে সক্ষম হন। সমাজ পরিবর্তিত হলেও তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনা। ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও সেই সকল পরিশ্রমী নিম্নবর্গের মানবজাতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাদের মধ্যে শুধু বেচেঁ থাকে প্রেম, আত্মসম্মানবোধ ও মনের কোণে ছাই চাপা আগুন। যা এই পরিবর্তিত শিক্ষিত সমাজের চোখকে ফাঁকি দেয়। শিক্ষিত, উচ্চবর্গের সমাজ বোঝে না যে তাদের আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকার আছে। সচ্ছলভাবে সকল সমাজাধিকার ভোগ করা থেকে তারা নিত্যই বঞ্চিত হচ্ছে। পরিবর্তিত এই সমাজ আধুনিকতার মুখে পড়ে দুটিভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই ভাগের ফলেই সাহিত্যকারের রচনায় উঠে এসেছে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ, ধনী-গরিব, উচ্চশ্রেণি-নিম্নশ্রেণি, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ব্যবধান চিত্রটি। আবার কখনো উঠে আসে সেইসকল শ্রেণির দাঙ্গার কথা, নিম্নবর্গের যন্ত্রণা-হাহাকারের রূপটি। এছাড়াও সেখানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় মুখ বুজে যন্ত্রণাকে সহ্য করার নির্বাক চিত্রটি কিংবা নিজের আত্মসম্মানকে উচ্চবর্গের যূপকাষ্ঠে বলি না দিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠার বাস্তব ছবিটি। আলোচ্য পত্রটিতে সেসব কথাই তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে বনফুলের 'ভোটার সাবিত্রীবালা', 'ছোটলোক', 'দূর্বা' ও 'বুধনী' গল্পের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে স্থান পাবে বাংলা ছোটগল্পে 'নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিফলন' উপাখ্যানটির কথা।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন বাঙালি লেখক হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি বনফুল নামেই পরিচিত। তিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় নাগরিক। আবার এই সমাজেরই তিনি একজন বাঙালি মানুষ ও বাঙালি লেখক। চিকিৎসক হিসেবে তিনি বহু স্থানে স্থানে ঘুরেছেন, সাক্ষাৎ পেয়েছেন বহুশ্রেণির মানুষের। তাঁর সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য "চিকিৎসক হিসেবে তিনি উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে শুরু করে সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সমাজ জীবনের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।"[১] আর তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে 'চরিত্র চিত্রশালা'র অফুরাণ বৈচিত্র্য পাঠক সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। শুধু চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলেননি, চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তুলে এনেছেন সমাজের কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্বকে। এই চরিত্রগুলো এসেছে তাঁর অভিজ্ঞতার স্তর থেকে। চরিত্রগুলো যেন তাঁর হয়েই কথা বলে। সমালোচকের মন্তব্য তাই যথার্থই প্রণিধান যোগ্য, "বনফুলের গল্পগুলোয় বাস্তবে দেখা ঘটনা ও চরিত্রের চিত্ররূপ ধরা পড়েছে।"[২]

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজের জঞ্জালময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অসহায়, খারাপ দিকগুলো প্রতিকারের উদ্দেশ্য লেখক কলম ধরেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যকে তথা পাঠক সমাজকে সতর্ক করা। সমাজে যে কাজ একজন নেতা, একজন পুলিশ বা একজন ডাক্তার করতে পারেন; সেই কাজ একজন লেখক কখনোই করতে পারেন না। লেখক তাঁর কলমে সমাজের ছবি আঁকেন, তা দেখে প্রতিকারের পথ নির্ধারণ করা যার যার নিজস্ব ব্যাপার।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ মানুষের উপকারে আসে, মানুষই মানুষকে সাহায্য করে। মানুষকে নিয়েই গঠিত হয় সমাজ সংসার। তাই মানুষ নিজেদের সুবিধার্থে গঠন করেছিল কিছু নীতি-নিয়ম, মানুষের মধ্যে এসেছিল স্বদেশ ভাবনা, এই দেশের ধারণা থেকেই জন্ম নেয় দেশ রক্ষা তথা মানব সভ্যতার সুস্থ বিকাশ ও প্রতিপালনের কথাটি। এই সূত্র ধরেই এসেছে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুনের কথা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মতে, মানুষের পাশে মানুষকে দাঁড়াতে গিয়ে কিংবা দেশ রক্ষার খাতিরে মানুষেরই জন প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয় প্রার্থী। তারা দেশের তথা দশের হয়ে কাজ করে এটাই ছিল নিয়ম। কিন্তু পরিবর্তিত এই আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। প্রার্থীদের মধ্যে পরোপকারী ও পরসহিষ্ণু মনোভাবের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। ভোটপ্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয় তারা। তাই সমালোচক বলেন, "প্রত্যক্ষ জগতেরই বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো অনুভবকে নিয়ে আরম্বরহীন নিরাসক্ত ভঙ্গীতে তিনি রচনা করেছেন গল্পের রূপমূর্তি- যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে জীবনের গভীরতম উপলব্ধি।"[৩]

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এমনই এক সমাজ ব্যবস্থার শিকার। এক বিধবা রমণীর করুণ বিষাদময় ও বিড়ম্বিত জীবনের আলেখ্য রচনা করেছেন তাঁর 'ভোটার সাবিত্রীবালা' গল্পের মধ্য দিয়ে। লেখক একাধারে সৎ, পরিশ্রমী, ও নিষ্ঠাবান ডাক্তার আবার তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক, দেশপ্রেমী এবং সমাজসেবী। তাই তাঁর চোখে যে ভাবে তথাকথিত সমাজের রাজনৈতিক দলাদলি ও প্রার্থী নির্বাচনের বিষময় দিকটি ধরা পড়েছে, তা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন লেখক বনফুল। সরাসরিভাবে না পারলেও লেখকের আন্তরিক ক্ষোভ মর্মজ্বালা প্রকাশ পেয়েছে গল্পটিতে। আর তা প্রকাশ করতেই তিনি ব্যবহার করেছেন সাবিত্রীবালা নাম্নী এক বিধবা রমণীকে। সাবিত্রীবালা নাম্নী বিধবা এই রমণীটি তাঁর জ্ঞানী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বিদ্যান স্বামী ও দুই পুত্রকে নিয়ে সুখেই সংসার করছিলেন। অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। তাঁর স্বামী ছিলেন টোলের পণ্ডিত, আর তিনি নিজে লোকের বাড়ি রাঁধুনী বৃত্তি করে সংসার চালাতেন। পয়সার অভাবে স্বামীকে চিকিৎসা করাতে পারেননি শেষে তাঁর স্বামী বিনা চিকিৎসায় মারা যান। লেখাপড়া শেখাতে না পারার জন্য ছেলে গুণ্ডা হয়ে ছুরিকাঘাতে মারা যায় এবং ছোট ছেলেটির যক্ষা হওযার পরও ভালো চিকিৎসা করাতে পারেননি, সর্বত্র ঘুষ চেয়েছে। শেষে সেই ছেলেটিও একদিন গভীর রাতে রক্তবমির মাধ্যমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। এর দুইমাস পরেই ছিল নির্বাচন। সাবিত্রীবালা একজন ভোটার। তাই এক ভোটপ্রার্থী তার দরজায় এসে কড়া নাড়ে একটি ভোটের আশায়। কিন্তু সাবিত্রী তাকে যোগ্য জবাব দিয়ে বাড়ি ছাড়া করেন। ওই ভোটপ্রার্থী ব্যাক্তিটি যখন গদিতে ছিলেন, তখন সাবিত্রী তাঁর বিদ্বান স্বামীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছেন। পয়সার অভাবে বড়ো ছেলের শেষ কাজ পর্যন্ত করতে পারেননি। কোথায় ছিল তখন এই ভোটপ্রার্থী, একবার তো তাকিয়েও দেখেনি। সাবিত্রী তাঁর পরিবারের সকলকে হারিয়েছেন ভিখারীর মতো। তাই ভোটপ্রার্থীকে সাবিত্রী তার যোগ্য জবাব জানায় এভাবে, "আপনাদের ভোট দেব কেন, কাউকেই ভোট দেব না-"[৪] এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন, "বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে।"[৫] এরপর তিনি দড়াম করে দরজার কপাটটি বন্ধ করে দেন ভোটপ্রার্থীর মুখের ওপর। লেখক এভাবে সাবিত্রীবালার মাধ্যমে তাঁর মনের জ্বালা মিটিয়েছেন। পরিবর্তিত এই সমাজের আধুনিক রাজনীতি নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র, অসহায়, সাবিত্রীর পরিবারকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। রাঁধুনী সাবিত্রীর বলিষ্ঠ চরিত্র ভদ্রলোকের বাড়িয়ে দেওয়া দু-টাকা মাইনে নিতে যেমন রাজি নয়, তেমনই মেকী রাজনীতির সামনে দড়াজ গলায় প্রতিবাদ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা।

এছাড়াও আমরা দেখি সমাজের কিছু ভদ্রশ্রেণির, উন্নতমস্তক, উচ্চবৃত্তিধারী সম্ভ্রান্ত মানুষের নকল ভদ্রতার মুখোশটি টেনে খুলে দেখিয়েছেন লেখক বনফুল তাঁর 'ছোটলোক' নামক গল্পটির মাধ্যমে। সমাজে অনমনীয় রাঘব সরকারের মতো কিছু চরিত্র আছে সর্বদা যাঁদের উন্নত শির, তাঁরা কখনো কারো প্রত্যাশী নয়, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কারো দ্বারা উপকৃত হতে চান না। তাঁর উন্নতমস্তক যেমন বিক্ষত পদদ্বয়ে কণ্টকসঙ্কুল জুতোজোড়াকে লক্ষ করে না, তেমনি সমাজে নিম্নবৃত্তিধারী খেঁটে খাওয়া কায়িক পরিশ্রমী রিকশাওয়ালার আত্মসম্মানের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না। আর তাই চলার পথে রিকশাওয়ালার কাকুতি দেখে তিনি দয়াদ্র হলেন

বটে, কিন্তু "তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিকশা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন।"[৬] কাজেই তিনি করুণাসিন্ধু উদ্বেল হয়ে নিম্নবর্গীয় রিকশাওয়ালাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখতে গেলেন। রিকশায় না চড়েই তাকে তার পারিশ্রমিক 'ছয়টি পয়সা' দিতে চাইলেন এবং তৎসঙ্গে জানালেন, "রিকশা চড়া পাপ।"[৭] কিন্তু 'ছোটলোক' দিনমজুর রিকশাওয়ালারও যে আত্মসম্মান থাকতে পারে সেদিকে "উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই।"[৮] কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রিকশাওয়ালা তার আত্মসম্মান বোধের জন্য রাঘব সরকারের দয়াভিক্ষা গ্রহণ করতে তৎপর নয়। আর তাই সৎ চরিত্রে অধিকারী রিকশাওয়ালা তার শেষ জবাবটি রাঘব সরকারকে দিয়ে যান এবং বলেন, "আমি কারও কাছ থাকে ভিক্ষা নেই না।"[৯] –একটি রিকশাওয়ালার মুখ থেকে রাঘব সরকার এমন কথা শুনবেন সেটা হয়তো তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। প্রগাঢ় আত্মচেতনার অধিকারী রিকশাওয়ালা সম্পর্কে গবেষক বলেন, "গরিব হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা সম্পন্ন একটা বোধ আছে। রিকশাওয়ালা তাই গরিব ও ছোটলোক হলেও আত্মচেতনার জন্যই নিজ আত্মসম্মানবোধ হারাতে চান না। দয়া তাই তার কাছে ভিক্ষাবৃত্ত বলে মনে হয়।"[১০] সমাজে রাঘব সরকারের মতোই কিছু চরিত্র আছেন যাঁরা নিজের উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে সাধারণ দরিদ্র সমাজে মানুষের মধ্যে থাকা আত্মমর্যাদার কথা ভুলে যান। সমাজে রিকশাওয়ালার উক্তির গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে সমালোচকের মন্তব্য "এই পরিবর্তিত সমাজে যেখানে ঐতিহ্যমণ্ডিত অনেক মূল্যবোধই হয় মৃত, নয় আক্রান্ত, দ্বন্দ্ব সংঘাত, মিথ্যা জালিয়াতি জুয়াচুরি, দুর্নীতি যেখানে সহজে স্বীকৃত সেখানে এই ধরণের উক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসাকে একেবারে হারিয়ে যেতে দেয় না।"[১১] গল্পটি তাই আধুনিক সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে নিম্নবর্গীয় মানুষের হয়ে কথা বলে। ধিক্কার জানায় ধনীক শ্রেণির দয়াদ্র রাঘব সরকারদের। গল্পের মূল চরিত্র সম্পর্কে গবেষক বলেন "...প্রথম থেকে শেষের আগে পর্যন্ত রাঘব সরকারই গতি সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে সচল থেকেছে; শেষে রাঘব পরাজিত, জয়ী হয়েছে রিকশাওয়ালা-লেখকের মূল লক্ষ্যের চরিত্র-রিকশাওয়ালা-- সেই 'ছোটলোক'।"[১২] সে নিম্নবর্গের এক রিকশা চালক হয়েও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে রাঘব সরকারদের মতো উচ্চবর্গীয়ের চেয়ে অনেক ওপরে, ছোটলোক হয়েও রাঘব সরকারের থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ের। আর তাকে এই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে সহায়ক হয়েছে তার দৃঢ় আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ।

এবার ধরা যাক, লেখকের আপন অভিজ্ঞতালব্ধ একটি গল্পের কথা। গল্পটি 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট গল্প, যার নাম 'দূর্বা'। গল্পটিতে লেখক কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দশ বছর আগে গ্রীষ্মকালে তিনি একবার গিয়েছিলেন ভাগলপুরে ডাক্তার হিসেবে। সেখানে গিয়ে তাঁকে যেতে হয় কলুই নামের এক চামারের বাড়িতে। তাদের বাড়ির চারিদিক নোংরা, মাছি ভন্-ভন্ করছে, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পেট কৃমিতে ভরপুর। কলুই শুয়ে ছিল একটা ময়লা কাঁথার ওপর, চারিদিকে তার বিষ্ঠা আর বমি। এ অবস্থায় কথকের মনে হয়েছে জীবনযুদ্ধে এ সমস্ত দরিদ্ররা কী আদৌ টিকতে পারবে? যারা নাকি খেতে পায়না, রোগে ভোগে, শিক্ষা নেই একবিন্দু, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই পর্যন্ত। ওনার মনে হয়েছে জন্ম নিয়ন্ত্রণই এর সমাধান, সঙ্গে চাই শিক্ষা।

আবার আরো দশ বছর পর বর্ষাকালে কথক সিভিল সার্জন হয়ে সেই ভাগলপুরেই আসেন। এসে সেই কলুইয়ের বাড়িতে দেখা করতে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন দশ বছর আগে গ্রীষ্মকালে যে জায়গাটা মরুভূমির মতো মনে হয়েছিল, আজ বর্ষাকালে তার চেহারা বদলে চারিদিক সবুজ দুর্বাদলে ছেয়ে গেছে। কলুই দশ বছরেও বিশেষ বদলায়নি। তার মা-দিদিমাও বেঁচে আছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো সব বড়ো হয়েছে, তাদেরও বিয়ে হয়ে ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতায় বিশ্বাসী হয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে জন্ম দেওয়ার পরই কথক তাঁক স্ত্রীর টিউব কাটিয়ে ফেলেন। পাইলট হয়ে প্লেনক্রাসে ছেলেটি মারা যায় এবং মেয়েটির টি-বি হয়ে স্ন্যানাটোরিয়ামে আছে। কথকের গাড়ি-বাড়ি, মোটা মাইনে সবই আছে কিন্তু সুখ নেই। অন্যদিকে এই কলুই চামারদের হয়তো ওসব কিছুই নেই, তবু তাদের ঘরে শান্তি বহমান। নানা দুঃখ-দুর্দশা থাকা সত্ত্বেও এরা কথকের চেয়ে বেশি সুখী। সাধারণ বাঙালি জাতি হল লেখকের ভাষায় 'মারশুমি ফুল'। যাদের আবর্ভাব ঘটে নির্দিষ্ট সময়ে

শরৎ, হেমন্ত বা বসন্ত কালে। গ্রীষ্ম কালে কাঠ ফাটা রৌদ্রেই যার শোভা নষ্ট হয়ে যায়। রস শুকিয়ে গিয়ে দেখা দেয় কালো বিষণ্ণ রূপ ও ধীরে ধীরে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু কলুই চামককা হল 'দূর্বাদল' যারা বছরের সবসময়ই বিরাজ করছে মাঠে-ঘাটে-বাটে। তাদের পায়ে মাড়িয়ে গেলেও তারা আবার উঠে দাঁড়ায় এবং অপেক্ষা করে আরো এক পদতলের জন্য। তারা এভাবেই অভ্যস্ত, এভাবেই জীবন অতিবাহিত হয় তাদের। শুধু অধীর আগ্রহে দিন গণে কবে বর্ষা আসবে, কবে দু-ফোঁটা জল পড়বে তাদের ওপরে, কবে দেখা দেবে তাদের আসল রূপ-আসল রং। সামান্য দু-ফোঁটা বৃষ্টির জলেই তারা ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। চতুর্দিক ভরে যারে শ্যামলা-সবুজ রঙে।

তারপরই একদিন হল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন। এক শিক্ষিত বাঙালি যুবক কমিশনার হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। তার বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল কলুই চামার। কলুইয়ের জাতভাই এতো বেশি যে বাঙালি যুবককে হারিয়ে কলুইকেই তারা জিতিয়ে দিল। তাই কথকের মনে হয়েছে 'শৌখিন মরশুমি ফুলের গাছ' রূপী বাঙালি মানুষেরা কোনদিনই দুর্বাঘাসরূপী কলুই চামারদের হারাতে পারবে না।

এরপর আমরা দেখি 'বুধনী' গল্পটি, যেখানে সবকিছুর থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের প্রেম। এখানেও গল্পকার কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বুধনী-বিল্টুর প্রেমের ইতিহাসকে বর্ণনা করে গেছেন। লেখক একদিন জেলখানায় বেড়াতে গিয়ে এক আর্ত করুণ চিৎকার শুনতে পান "বুধনী-বুধনী-বুধনী।"[১৩] হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশে বাস সেই যুবক বিল্টুর। বন্য পশুর মতো বুধনীকে তাড়া করতে করতে একদিন সকল শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিল্টু বুধনীকে জয় করেছিল। অসভ্য বিল্টু জংলী বুধনীকে পেয়ে কী প্রকারে প্রণয় নিবেদন করেছিল তা লেখকের কল্পনাতীত। তিনি শুধু এইটুকু জানেন, "বিবাহের পর বিল্টু বুধনীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই- একদণ্ডও নয়।"[১৪] কিন্তু হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটে গেল যার জন্য বিল্টুকে জেলে যেতে হল। বুধনী একটি সন্তান প্রসব করল এবং মাতৃত্ব লাভে যেন স্বর্গসুখ পেল। নারীর নারীত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় তার জননী সত্তায়। বুধনী সেদিন "নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।"[১৫] বিল্টু তখন বুঝতে পারে যে বুধনী শুধু তার একার নেই; তাকে "দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা!"[১৬] এই অসহ্যকার পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য আজ বিল্টুকে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে কারণ সে 'নৃশংসশিশু-হত্যাকারী'। প্রেমের কাছে মাতৃত্বের পরাজয় এ গল্পের মূল কথা। বিল্টুর প্রেম এতটাই নৃশংস যে নিজের সন্তানকে হত্যা করতেও তার দু-হাত কাঁপেনি। সে শুধু একজন জংলী ব্যাধই নয় এক স্বার্থপর প্রেমিক পুরুষ। গল্পের শেষে এই নিম্নবর্গীয় যুবক বিল্টুর প্রেমই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে- "যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করিয়া গেল- বুধনী-বুধনী-বুধনী-বুধনী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।"[১৭] বিল্টু একজন জংলী বলেই হয়তো একাজ তার পক্ষে সম্ভবপর। কিন্তু, আমরা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষেরা হয়তো বিল্টুর এ কাজের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সাহস করব না; শুধু এটুকুই বলতে পারি প্রেমের নেশায় অন্ধ হয়ে বিল্টু বুঝতে পারল না যে, "পুত্র তারই অংশ, তারই সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম, কিন্তু তাকেও অসহ্য মনে হওয়ার মূলে আছে বুধনীর প্রতি একমাত্র প্রেম চেতনার আকর্ষণের ভয়াবহতা।"[১৮] নিম্নবর্গীয় সমাজে প্রেম যে কীরূপ কড়ালমূর্তি ধারণ করতে পারে 'বুধনী' গল্পটি তার একমাত্র নিদর্শন।

উপরোক্ত গল্পালোচনার মাধ্যমে বনফুলের নিম্নবর্গীয় সমাজ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে তাঁর নিজের মর্মজ্বালা, সহানুভূতি, অনুশোচনার স্পষ্ট দিকগুলি। একজন নাগরিক হয়ে ভোটপ্রার্থীর প্রতি তাঁর মর্মজ্বালা, একজন মানুষ হয়ে রিকশাওয়ালার প্রতি তাঁর সহানুভূতি, একজন ডাক্তার হয়ে তাঁর ভুল ভাবনার জন্য অনুশোচনা ও একজন স্বামী, একজন পিতা হয়ে এক শিশু হত্যাকারী যুবকের প্রেম কী করে শেষ পর্যন্ত টিকে সেসব দিকই তুলে এনেছেন বনফুল তাঁর কলমে। সমাজ সচেতন একজন ভারতীয় নাগরিক-চিকিৎসক-সমাজসেবক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে, "জীবন সম্পর্কে তাঁর যে পর্যবেক্ষণ উপস্থিত করেছেন তা এককথায় অনবদ্য। বাস্তবজীবনে এর হেরফের হতে পারে। কিন্তু আদর্শ মানবিকতাবাদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।"[১৯] --বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজের এক চিত্রকর হিসেবে বনফুলের প্রতিচ্ছবি চির অমর হয়ে থাকবে পাঠকসমাজের মানসমুকুরে।

তথ্য সূত্র:

১. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, বর্ণালী, কলকাতা, প্রকাশকাল: ১৯৯৮, পৃ. ১০২
২. বিপ্লব চক্রবর্তী, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), সাহিত্য অকাদেমি নতুন দিল্লী, চতুর্থ মুদ্রণ: ২০১৬, পৃ. ১৯
৩. ঊর্মি নন্দী, বনফুল: জীবন মন ও সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭, পৃ. ৭৪
৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা), একুশটি বাংলা গল্প, ন্যাশনাল বুক, ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী, একাদশ পুনর্মুদ্রণ: ২০১২, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ১১
৬. বনফুল, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা, ষষ্ঠ বাণীশিল্প সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৩৯
৭. তদেব, পৃ. ১৪০
৮. তদেব, পৃ. ১৩৯
৯. তদেব, পৃ. ১৪০
১০. শীতল চৌধুরী, বাংলা ছোটগল্প: মননে দর্পণে (প্রথম খণ্ড), বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রকাশ: ২০০৫, পৃ. ১১৫
১১. সরোজমোহন মিত্র, বনফুলের ছোটগল্প, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯০৬, পৃ. ৩৩
১২. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫, পৃ. ৫৬৬
১৩. বনফুল, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা, ষষ্ঠ বাণীশিল্প সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৯
১৪. তদেব, পৃ. ৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ৩৮
১৬. তদেব, পৃ. ৩৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯
১৮. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১ম), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫, পৃ. ৫৭৮
১৯. সরোজমোহন মিত্র, বনফুলের ছোটগল্প, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯০৬, পৃ. ১০২